বিশেষ রচনা

কিডনি - কাহিনী

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে ভারতে এখনো অব্দি কতজন কিডনি রোগী আছে, এদের মধ্যে অন্তিম অবস্থায় (end-stage kidney disease) এবং কজনের এখুনি কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান বা রেজিস্ট্রি নেই। এসব সত্বেও কিছু পরিসংখ্যান বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসক গবেষকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এরকম একটি মারাত্মক অসুস্থতার সাথে যুঝে ওঠার জন্য। একটি সাম্প্রতিক হিসেব বলছে ভারতে প্রতিবছর ১,৭০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ মানুষ end-stage kidney disease-এ আক্রান্ত হন। আর ভারতে প্রতি বছরে মোট কিডনি প্রতিস্থাপনের সংখ্যা মেরে-কেটে ৭০০০। ফলে সবসময়েই প্রয়োজন এবং সরবরাহের মাঝে বিপুল ঘাটতি থাকে। এ ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে কিডনি চোরাচালানের সামাজিক বাস্তবতা। এ ছাড়াও আরেকটি দিক রয়েছে। এদেশে কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচ ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে অনেক কম। ফলে এখানে এসে প্রতিস্থাপন করালে তার খরচ অনেক কম পড়ে। এ ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবেশ করে একটি নতুন শব্দবন্ধ- medical tourism ইউরোপ আমেরিকা আরব দেশের বিত্তশালী রোগীর চাহিদা মেটায় ভারতের দরিদ্র মানুষ।

এরকম এক প্রেক্ষিত থেকে আমরা বুঝতে চাইবো এদেশের কিডনি রোগ ও তার সমস্যার কথা।

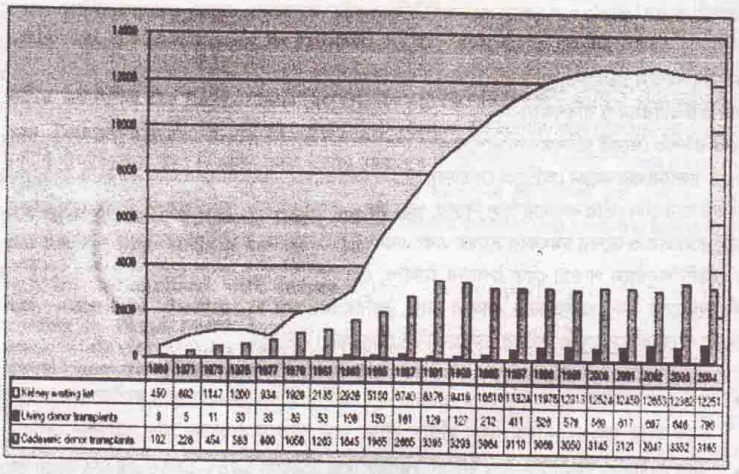

	1969	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Kidney waiting list	450	682	1147	1200	934	1929	2135	2928	5150	6740	8376	9416	10510	11324	11975	12313	12524	12450	12653	12382	12251
Living donor transplants	9	5	11	30	38	85	53	109	150	161	129	127	212	411	526	579	590	617	597	646	796
Cadaveric donor transplants	102	228	454	583	600	1050	1263	1645	1965	2665	3395	3293	3064	3110	3066	3050	3145	3121	3047	3352	3165

একটি পুরনো কাহিনী ঃ—

এ হলো আমেরিকার দু বোনের কাহিনী। এই দু বোন, যোহানা এবং লানা, যমজ। চিকিৎসার পরিভাষায় এরা প্রায় পুরোপুরি একরকম যমজ। ১৯৪৮ সালে জন্ম এদের। বারো বছর বয়সে কিডনি প্রতিস্থাপন হয় যোহানার। বয়স কম বলে যোহানার জন্য লানার নিজের কিডনি দেবার আর্জি বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে Supreme Judicial Court of Massachusetts-এ বিচারক লানার কাছে জানতে চান যে এখানেও যদি তাকে না করা হয় তাহলে সে কি করবে। লানার স্পষ্ট জবাব ছিলো- "I'll go to a higher court." এর পরে বিচারক আর না করতে পারেন নি। ১৯৬০ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর এদের কিডনি প্রতিস্থাপন হয়। ৫২ বছর পরেও দু বোন-ই সুস্থ সবল হাসিখুশি জীবন যাপন করছে। এদের প্রতিস্থাপন এখনো অবধি সবচেয়ে বেশী দিন বেঁচে থাকা প্রতিস্থাপনের জীবিত প্রমাণ। কিন্তু বাস্তব হল যে একদিকে যেমন সবাই যোহানা এবং লানা নয়, অন্যদিকে ভারতের মতো দরিদ্র দেশে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ। রোগের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজন বিশেষ কাজ করে না। যদিও এ কথা সত্যি যে কিছু রোগ অবস্থাপন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বেশী হয়, কিছু রোগ দরিদ্রদের মধ্যে বেশী। তা সত্বেও সাধারণ বিচারে রোগের শ্রেণী বিভাজন বাস্তবত বিচার্য হয় না। এ জন্য কিডনির রোগ ধনী দরিদ্র নিরপেক্ষ ভাবে হয়। কিন্তু চিকিৎসা করার ক্ষমতা রয়েছে বিত্তশালী মানুষের।

আমাদের আলোচনায় দেখবো কিভাবে এরকম এক সামাজিক অবস্থায় কিডনি কেনা-বেচার একটি বাজার গড়ে ওঠে। সে বাজারে কেউ ক্রেতা কেউ বিক্রেতা। ২০০৯ সালের একটি রিপোর্ট বলছে এই মুহূর্তে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ কিডনি প্রতিস্থাপন করে বেঁচে আছেন। ২০১২-র শেষে এসে সংখ্যাটা নিশ্চয়-ই আরও বেড়ে গিয়েছে। ২ কোটি মানুষ একটি প্রযুক্তির জোরে নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছেন এ তো ছেলেমানুষি নয়। আবার

বেঁচে থাকার জন্য জন্ম নিচ্ছে যে transplant tourism এবং কিডনির চোরা-বাজার সেটাও ফ্যালনা নয়। আমরা ২য় বিষয়টি নিয়ে এবার কথা বলবো। এ শুধুমাত্র ভারতের নয়, সমগ্র গরীব দুনিয়ার সমস্যা।

ভারতের চালচিত্র ঃ—

আমাদের প্রাথমিক আলোচনার গোড়াতে গুরুত্বপূর্ণ The Guardian পত্রিকার একটি রিপোর্ট (২৭শে মে, ২০১২) উল্লেখ করি। ইংরেজি সংবাদপত্রের হুবহু রিপোর্টটি এ রকম - The **illegal trade in kidneys** has risen to such a level that an estimated 10,000 black market operations involving purshased human organs now take place annually, or **more than one an hour,** World Health Organisation experts have revealed ... Patients, many of whom will go to China, India or Pakistan for surgery, can pay up to $200,000 (nearly £128,000) for a kidney to gangs who harvest organs from vulnerable, desperate people, sometimes for as little as $ 5,000. The vast sums to be made by both traffickers and surgeons have been underlined by the arrest by Israeli police last week of 10 people, including a doctor, suspected of belonging to an international organ trafficking ring and of committing extortion, tax fraud and grievous bodily harm. Other illicit organ trafficking rings have been uncovered in India and Pakistan ... **Kidneys make up 75% of the global illicit trade in organs,** Noel estimates. Rising rates of diabetes, high blood pressure and heart problems are causing demand for kidneys to far outstrip supply. Data from the WHO shows that of the 106,879 solid organs known to have been transplanted in 95 member states in 2010 (legally and illegally), about 73,179 (68.5%) were kidneys. But those 106,879 operations satisfied just 10% of the global need, the WHO said.

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা The Telegraph-এর রিপোর্ট (১৯শে নভেম্বর, ২০১২) - Jim Feehally, a professor of renal medicine at University Hospitals of Leicester NHS trust, told the Guardian : "We know of countries in Asia, and also in eastern Europe, which provide a market so that people who need a kidney can go there and buy one. "**The people who gain are the rich transplant patients** who can afford to buy a kidney, the doctors and hospital administrators, and the middlemen, the traffickers. It's absolutely wrong, morally wrong."

ভারতীয় সংবাদপত্র The Times of India (১০ মে, ২০১২) রিপোর্ট করছে - Indian Society of Organ Transplantation-এর পূর্বতন চেয়ারম্যান গোপাল কিষান অভিয়োগ করছেন যে সরকারি ঔদাসিন্যের জন্য কিডনির চোরা-বাজার রমরমিয়ে বাড়ছে।

২০শে নভেম্বর, ২০১২-র Khaleej Times -এর রিপোর্ট - In the last two decades, illegal organ trade – particularly of kidneys – has experienced an unprecedented boom in countries like Pakistan, India and China. And this underhanded activity has become greatly **institutionalised, with surgeons and vendors partaking in criminal rings,** which take advantage of the sellers and the buyers to make a quick buck. According to World Health Organisation experts, roughly 10,000 illegal kidney operations take every year worldwide. And this figure is **still modest** since exact figures of illegal kidney transplants are **difficult to determine.**

গুরুত্বপূর্ণ হোল ২০০৮-এর ৩০ এপ্রিল -২ মে ইস্তানবুলে The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে - The *Istanbul Declaration* proclaims that the poor who sell their organs are being exploited, whether by richer people within their own countries or by transplant tourists from abroad ... Participants in the Istanbue Summit concluded that transplant commercialism, which targets the **vulnerable,** transplant tourism, and organ trafficking **should be prohibited.**

এসবেরও পরেও দরিদ্র মানুষের কিডনি যথেচ্ছ বিক্রি হয়। নীচের ছবি দুটি তার প্রমাণ। প্রথম ছবিটি পাকিস্তানের, দ্বিতীয়টি ভারতের।

১১ জুন, ২০১২-র Times of India-র রিপোর্ট জানাচ্ছে ভারতে ২০০,০০০-এরও বেশী কিডনির রোগীর প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। কিডনি পাওয়া যায় ২০০০-এরও কম। অধিকাংশ রোগী মারা যায় কিডনি না পেয়ে। এরকম এক বৈষম্য যখন সামাজিকভাবে বিরাজ করে তখন পণ্য অর্থনীতির নিয়ম মেনে সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার আর্থিক বিনিময় চলবে।

একটি আন্তর্জাতিক হিসেব অনুযায়ী এদেশে একটি চোরা কিডনির দর মোটামুটি ১৫০০-২০০০ ডলার। এরই দাম মলদোভাতে ২৭০০ ডলার, ব্রাজিল/তুরস্কে ৬০০০ ডলার, ইজরায়েল ১৫,০০০ - ২০,০০০ ডলার, আর আমেরিকাতে ৩০,০০০ ডলার। স্বাভাবিক নিয়মে ৩০,০০০ ডলারের পণ্য ২,০০০ ডলারে পাওয়া গেলে এদেশে transplant tourism এবং medical tourism -এর বাজার ক্রমশ বাড়বে।

এখানে দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসবে। (১) মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি এভাবে কেনা-বেচা করার মতো পণ্য সামগ্রী? , (২) এর ফলশ্রুতিতে transplant tourism এবং medical tourism -এর যে বাজার গড়ে উঠছে তা কি চিকিৎসক সমাজের নিতান্ত ক্ষুদ্র হলেও একটি অংশের অংশগ্রহণ, প্রশাসনের একাংশের যোগাযোগ এবং সর্বোপরি, আংশিক পরিমাণে হলেও সামাজিক অনুমোদন ছাড়া সম্ভব? তৃতীয় কারণটি উল্লেখ করা প্রয়োজন এ জন্য যে এখনও যখন সামাজিক ফতোয়ায় মেয়েদের বাল্য বিবাহ, ভ্রূণ-হত্যা, ডাইনি সন্দেহে হত্যা, গণপ্রহারে মৃত্যু বা আরও কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটে তখন কোন না কোনভাবে সামাজিক একটি অনুমোদন তো থাকেই। এ ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যের কারণে হলেও কিডনি যখন বিক্রি করা হয় তখন সমাজতত্ব এবং সাধারণ বুদ্ধি বলে যে এক ধরনের tacit সামাজিক গ্রাহ্যতা তৈরি হয়েছে।

ভারত ও পশ্চিমবাংলা ঃ—

Chronic kidney disease (CKD) একটি অসুখ। এ অসুখের অর্থ এটা নয় যে সবক্ষেত্রে এটা অল্পদিনের মধ্যেই end-stage kidney disease-এর (ESRD) চেহারা নেবে। ভারতীয় চিকিৎসকদের গবেষণাপত্র দেখিয়েছে প্রধানত তিনটি কারণের জন্য CKD দ্রুত ESRD-তে রূপান্তরিত হয় - (১) চিকিৎসার সুযোগের অভাব, (২) risk factor ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা, এবং (৩) নেফ্রোলজিস্ট-এর কাছে পাঠাতে দেরী করা। প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ ESRD রোগীর মধ্যে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০-এর চিকিৎসা হয়। মোট রোগীর তিন-চতুর্থাংশ হোল গ্রামাঞ্চলের মানুষ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের নজরে থাকা প্রয়োজন। কিডনির রোগের চিকিৎসার খুব সামান্য অংশই সরকারী হাসপাতালে হয়। প্রায় সবটাই হয় প্রাইভেট হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে। এর বিপুল ব্যয়ভার বহন করা দরিদ্র মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ফলে অচিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা চিকিৎসিত রোগীর চাইতে বহুগুণ বেশী। অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পায়। দেশের GDP-তে এর প্রভাব পড়ে।

আমাদের কি এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে? চেন্নাই-এ ড. মানির নেতৃত্বে Kidney Help Trust বলে একটি সংস্থা তৈরী হয়েছে। ২৫,০০০ দরিদ্র মানুষের মাঝে এঁরা কিডনির অসুখের চরম অবস্থা ঠেকানোর জন্য নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সবচেয়ে সস্তা ওষুধের সাহায্যে কিভাবে প্রধান দুটি সমস্যা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সে ব্যাপারে লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় এরকম কোন উদ্যোগ এখনও অনুপস্থিত।

পশ্চিমবাংলার কিছু কথা ঃ—

সাম্প্রতিক সময়ে ই-টিভি-র উদ্যোগে এ রাজ্যে কিডনির চোরা বাজার এবং মরণোত্তর অঙ্গদান নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রচারের জন্য সন্দেহ নেই কিছু মানুষের মাঝে এ নিয়ে একটি মানসিক বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত করতে হবে কয়েক দশক ধরে গণদর্পণ সংস্থার লাগাতার প্রচেষ্টা। খুব সম্প্রতি ১৪-২৮ শে অক্টোবর ২০১২ মরণোত্তর অঙ্গদান ও দেহদানের সামাজিক বার্তা জন্ম দেবার জন্য এদের উদ্যোগ কলকাতা থেকে কুচবিহার সাইকেল যাত্রা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের পরিসরে জবা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অ-সরকারি সংগঠন SMOKUS রায়গঞ্জের বিন্দোল অঞ্চলে কিডনির চোরা-চক্র উদঘাটনের ব্যাপারে ধারাবাহিক উদ্যোগ নিয়েছে। রায়গঞ্জের বাসিন্দা অশীতিপর বৃদ্ধা করুণাময়ী ভট্টাচার্য ২০০৯ সালে তাঁর মরণোত্তর দেহ ও চক্ষু দান করে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেছেন।

এরকম উজ্জ্বল কাহিনী ও প্রচেষ্টার পাশে অনেকটা জুড়ে কালো অঞ্চল আছে। আমাদের সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার।

SMOKUS-এর আংশিক তথ্যও এ কথা পরিষ্কার করে যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে অন্তত ৩০ জন হতদরিদ্র মানুষের কিডনি কেটে নেওয়া হয়েছে - কখনো ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে, আবার কখনো হয়তো বা পেশী শক্তির জোরে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে প্রাশাসনিক কর্তারা জেনেও না জেনে থেকেছেন। ই টিভি-র উদ্যোগে হৈ চৈ শুরু হবার পরে এদের পান্ডা রাজ্জাক-কে পুলিশ ধরেছে। দুয়েকটা নিদারুণ তথ্য দেওয়া যাক।

এ ছবিটি ৫০ বছরের এক প্রৌঢ়ের। নাম যোগেন হাঁসদা। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাজবিন্দোল গ্রাম। ২০০০ সালে যে চেন্নাইতে ড. মানির নেতৃত্বে সামাজিক উদ্যোগ চলে সে চেন্নাইতে এর কিডনি কেটে নেওয়া হয়। আজ অবধি কোন প্রতিকার পান নি।

এ ছবিটি ৩০ বছরের এক যুবকের। নাম ছোট মুর্মু। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাজবিন্দোল গ্রাম। হতদরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। ২০০৮-এ মুম্বাইতে কিডনি কেটে নেওয়া হয়। যথারীতি কোন প্রতিকার পায় নি।

এ ছবিটি ৩৫ বছরের এক যুবকের। নাম মুন্সি টুডু। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাজবিন্দোল গ্রাম। হতদরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। ২০০২-এ লখনউ-এ এর কিডনি কেটে নেওয়া হয়। যথারীতি কোন প্রতিকার পায় নি।

এছাড়াও আছে বম আবু বকর সিদ্দিকির মতো ২৫ বছরের হতদরিদ্র ভূমিহীন কৃষক। ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ১৯৯৮ সালে এর কিডনি কেটে নেওয়া হয়।

এদের সবার বয়ান কমবেশী একরকম। কাজের প্রলোভন, সংসারের খানিকটা হলেও আর্থিক সুরাহার প্রতিশ্রুতি, এবং শেষ অবধি হাতে সারা জীবনের জন্য ১,০০০ থেকে ২,৫০০ টাকা। কারো কাছে বলার নেই, কেউ অভিযোগ গুরুত্ব দেয় না। কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলা এবং SMOKUS-এর মতো কোন সংস্থাকে পেলে অসহায়তার নিদারুণ হাহাকার স্ফুট হয়।

এ রকম ঘটনা হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, এলাহাবাদ, মুম্বাই, চেন্নাই, সুরাত সর্বত্র ঘটছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, ইরানে কিডনি কেনা-বেচাকে আইনী চেহারা দেওয়া হয়েছে আর্থিক, সামাজিক এবং চিকিৎসাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিনিময়ে। যদিও পৃথিবী অন্য কোন দেশ এ পন্থা গ্রহণ করে নি।

সমাধান সূত্র ঃ—

ই-টিভি, গণদর্পণ, অশীতিপর বৃদ্ধা করুণাময়ী ভট্টাচার্য বা SMOKUS-এর যেসব উদ্যোগ এগুলোগে সম্মিলিত করে সামাজিক চেহারা দিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। এটা একজন কারো কাজ নয়, সম্ভবও নয়। SSKM হাসপাতালে ড. রাজেন পান্ডের নেতৃত্বে এ কাজ শুরু হয়েছে। IMA সহ সব স্তরের চিকিৎসকদের এ সামাজিক সংলাপ তৈরি দায়িত্ব নেওয়া তো একান্ত জরুরী। সামাজিক সংলাপ শুরু করতে হবেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। প্রশাসনকে সংবেদনশীল হতে হবে - যা এতদিন হয় নি। এখানে গণবিপ্লব ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গ উহ্য রাখাই ভাল। আমাদের দৌড় শুধু মরণোত্তর অঙ্গ প্রতিস্থাপন-এর মতো সামাজিক বার্তা বহন করার মতো কাজেই সীমাবদ্ধ থাকুক। যদি মরণোত্তর অঙ্গ প্রতিস্থাপন (cadaveric transplantation) এবং নিকটাত্মীয়ের অঙ্গ দান-কে সামাজিকভাবে গ্রহণীয় করে তোলা যায় (চেন্নাই, কেরল, মুম্বাই এবং গুজরাটে এটা বাস্তবায়িত হচ্ছে) তাহলে এরকম এক অসম্ভব পরিস্থিতিকে অল্প-বিস্তর হলেও মোকাবিলা করা সম্ভব।

Transplant tourism, medical tourism -এর মতো সামাজিকভাবে অপমানজনক বিষয়কে আমরা যদি আমাদের অসম্মান হিসেবেই ভাবতে না পারি তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আমাদের আত্মগৌরব, আমাদের প্রগতিমনস্কতা?

যদি ভুল করেও কখনো বাড়ির শিশুটি প্রশ্ন করে এসব হয় কেন, আমরা কি ওকে বকে দেব? বলবো - এসব বলতে নেই। আমরা এতদিন হতদরিদ্র মানুষের কিডনি কাটা আর কাটা কিডনি বিক্রীর বাজার দেখেছি। তোরাও এখন দ্যাখ দুচোখ ভরে। নইলে আর Transplant tourism, medical tourism এগুলো বাঁচে কি করে? বিত্তবানেরাই বা বাঁচে কি করে? বাঁচতে তো হবে!

বিন্দোল - কিডনী যেখানে পণ্য

আনোয়ার হোসেন

স্ত্রী-র চিকিৎসা, মেয়ের বিয়ে, জমি কিনে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, বিয়ের পরে পণের টাকা শোধ, প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক অর্থনীতির মানুষের কাছে এগুলো নিত্যদিনের সমস্যা। সেই অর্থে বিপদ। এই বিপদে বিন্দোলের গরীব মানুষের পাশে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কিডনি। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল গ্রামপঞ্চায়েত। জালিপাড়া ও সন্নিহিত কিছু গ্রামের মানুষ। তারা জানে বিপদের দিনে তার একটা কিডনি বিক্রি করে মোটা (?) টাকা হাতে পাওয়া যায়। দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষগুলো জেনে গেছে অঙ্গ সংস্থানের কোন জায়গায় কিডনি থাকে। জেনে গেছে এইচ.এল.এ. ম্যাচিং-এর নাম।

গত ৯ই মার্চ, ২০১২। দি টাইম্‌স্ অফ্ ইন্ডিয়া তে শ্রী শুভ্র মৈত্র লিখলেন, "People sell kidney to beat starvation in West Bengal village."। শুরু করলেন, "Now, the dying men have started forcing their wives to give up a kidney."। টনক নড়ল প্রশাসনের প্রায় একই সময়ে ওই গ্রামপঞ্চায়েতের আগাবহর গ্রামে ঘটল নৃশংস এক ডাইনিহত্যার ঘটনা। জেলাস্তরে জরুরী ভিত্তিতে প্রশাসনিক সভা হল।

রায়গঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বি.এম.ও.এইচ., ডাঃ শ্যামশ্রী চাকী এবং বিন্দোল পি.এইচ.সি.-র মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নারায়ণ চক্রবর্তী মেডিক্যাল ক্যাম্পে মোট ৪৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সমীক্ষা করেন। এতে দেখা যায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি :—

৪৫ জনের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলা এবং ১ জন পুরুষ অবিবাহিত। বাকীরা সবাই বিবাহিত।

৩২ জনের ক্ষেত্রে জানা যায় কিডনি দেওয়ার সময় তাদের বয়স —

২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে = ৬ জন

২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে = ৮ জন

৩১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে = ১০ জন

৩৬ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে = ৪ জন

৪১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে = ৬ জন

নবজাত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম — একটি প্রাথমিক পরিচয়

বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেন

এই কলামে আমরা বিগত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত ও বহুল প্রচারিত **'সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Care)'** নিয়ে পাঠকদের একটি প্রাথমিক ধারনা দেবার চেষ্টা করেছি। ভারতীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাগজে কলমে প্রায় সবরকম ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা থাকলেও তা কার্যকরী হয় না, অনেক ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন বা বিরোধিতা করে ঠিক বিপরীত অনুশীলনটি করা হয় এবং কি করা উচিত ও কি করা হচ্ছে না তা দেখার ক্ষেত্রে সরকার থেকে নাগরিক সকলেই উদাসীন। মুখে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বলে কার্যত যোজনা কমিশনে এর বিপরীত অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিসেবা থেকে সরকারের ক্রমশ সরে আসা এবং বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ ও কর্পোরেটকরণের প্রস্তাবই নেওয়া হয়েছে। আর UHC-র বিতর্কের রেশ মিলাতে না মিলাতেই সরকার তিনটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবৃহৎ ও ব্যায়বহুল কর্মসূচী নিয়ে ব্যাপক প্রচার শুরু করেছেন। সেগুলি হল ঃ (১) **'নবজাত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম (Basic Newborn Care & Resuscitation Programme)**, (২) **'রাষ্ট্রীয় ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং পক্ষাঘাত প্রতিষেধক ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Strokes অথবা N.P.C.D.C.S.)** এবং (৩) **'Universal Diseases ad Deficiency Screening Programme for children.** এখানে স্বল্প পরিসরে আমরা প্রথমটির প্রাথমিক পরিচয় দেব।

'নবজাত শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম'টি 'রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের (NRHM)' অন্তর্গত 'জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY)' কার্যক্রমের বর্দ্ধিত রূপ যেখানে অন্তঃসত্বা মহিলাদের সুরক্ষার পাশাপাশি ১৫ বছর বয়স অবধি শিশুদের (Paediatric অথবা Children) সুরক্ষার বিশেষ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে **নবজাতকদের** (New born) সুরক্ষার উপর। মোদ্দা কথা আমাদের দেশে এখনবধি ব্যাপক হারে মাতৃত্ব জনিত মৃত্যু, শিশু মৃত্যু বিশেষ করে নবজাতকের মৃত্যু রোধ করতে এই কার্যক্রম।

জন্মের পর প্রথম মিনিটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্যক্রমে জন্ম মুহূর্তে শিশুদের সুস্থতা ও অসুস্থতার লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে চিকিৎসা, নার্সিং ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং 'ASHA' দের IMNCI ট্রেনিং চলছে এবং প্রসূতি কক্ষগুলি উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা ও মা ও শিশুর উপযুক্ত খাট, Radiant warmer, DDK, জীবাণুমুক্ত তোয়ালে, পোশাক ও মুখ ঢাকনি, ডায়াপার, self-inflating bag, eye drop, resuscitation kits, অক্সিজেন প্রভৃতি সরবরাহ করা হচ্ছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জোর দেওয়া হচ্ছে (১) নবজাতকের সঠিক পর্যালোচনা, (২) সমস্যা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রতিকার (Resuscitation) গ্রহণ করা, (৩) উষ্ণ তাপমাত্রা (২৫° সেলসিয়াস) বজায় রাখা, (৪) সঠিক শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাক পরিষ্কার রাখা, (৫) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, (৬) নাড়ির (unbilical cord) প্রতি যত্ন নেওয়া, (৭) নবজাতকের চোখের পরিচর্যা, (৮) মায়ের বুকের প্রথম দুধ (Colostrum) খাওয়ানো, (৯) ছ'মাস বয়স অবধি কেবলমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো (Exclusive Breast Feeding), (১১) নবজাতকদেরও ভালভাবে বুকের দুধ খাবার ব্যবস্থা করা, (১২) জন্মের পরপর নবজাতককে মায়ের সংস্পর্শে (Kangaroo Mother Care) পদ্ধতিতে রাখা, (১৩) নিয়মিত নবজাতকদের শ্বাস, স্তন্যপান, রেচন, ত্বকের তাপমাত্রা, ঘুম, আচরণ, বৃদ্ধি প্রভৃতির উপর নজর রাখা, (১৪) আগে জন্মানো (Preterm) ছোট (small for date) ও কম ওজনের (Low birth weight) অর্থাৎ আড়াই কিলোগ্রামের কম) নবজাতকদের বিশেষ পরিচর্যা, (১৫) নবজাতকের শারীরিক জটিলতা হলে উপযুক্ত ব্যবস্থাযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স করে উন্নত পরিষেবা কেন্দ্রে রেফার করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর। প্রতিটি ব্লক বা কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (BPHC বা CHC) গড়ে তোলা হচ্ছে, 'Sick Neonatal Stabilizing Unite' (SNSU) এবং প্রতিটি মহকুমা ও জেলা হাসপাতালে (SDH ও DH) গড়ে তোলা হচ্ছে 'Sick Neonatal Care Unit' (SNCU)। এছাড়াও ব্লক স্তর অবধি Nutritional Rehabilitation Centre (NRC), জেলা হাসপাতালগুলিতে Neonatal Ward গড়ে তোলা হচ্ছে এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। সংখ্যা ও নিযুক্তির সমস্যা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে গ্রহণযোগ্য অর্থ দিয়ে শিশু বিশেষজ্ঞ ও নার্সিং কর্মী ভাড়া করা হচ্ছে (Contract) এবং তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যবস্থা সহ হাসপাতালের শিশুবিভাগের আধুনিকিকরণ ঘটানো হচ্ছে।

ডিম নিয়ে দু-চার কথা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে হৃদরোগের (Coronary Heart Disease) বাড়বাড়ন্তের কারণে ডিম খাওয়া না খাওয়া নিয়ে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং বাল্য থেকে যৌবন অবধি মস্তিষ্ক ও শরীর গঠনের জন্য প্রোটিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এর মধ্যে প্রাণীজ প্রোটিনের গুণগত মান বেশী। আর ডিম হচ্ছে অত্যন্ত সুলভ, সহজপাচ্য এবং নয়টি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্য। কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন 'সি' ছাড়া ডিম আর সমস্ত খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ। সমস্ত জল ও চর্বিতে দ্রব ভিটামিন ডিমে উপস্থিত। একটি ডিমের আয়তনে ১২% খোলস, ৫৮% সাদা অংশ ও ৩০% কুসুম বা হলুদ অংশ। নেট প্রোটিন ব্যবহারের (NPU) দিক দিয়ে, যা জৈব গুণ, আত্তীকরণ ক্ষমতা সব নিয়ে হয়, ডিমকে ১০০ সূচক ধরা হয়। কাঁচা ডিম অন্ত্র দিয়ে ঠিককমত হজম হয় না, তাই ডিম সিদ্ধ করে খাওয়া উচিত। ডিমের কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিয়ে কথা উঠছে। জিনগত প্রবণতা (Genetic Proponderence), ছোটবেলা থেকে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত ও তৈলাক্ত খাদ্যগ্রহণ, দৈহিক পরিশ্রম না করা প্রভৃতি কারণে দেহে কোলেস্টরল বৃদ্ধি পায় ও হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে। সাধারণভাবে তাই ডিম খেতে কোন অসুবিধা নেই বরং উপকারী। বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদেরতো অতি প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র যাদের এ্যালার্জি আছে, রক্তে কোলেস্টরলের মাত্রা বেশী, কোরোনারি হৃদরোগ আছে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ডিম খাওয়া চলবে না। কিছু ক্ষেত্রে ডিমের হলুদ অংশ বাদ দিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

এবার আসুন একটি ১০০ গ্রাম ডিমে কি কি রয়েছে দেখে নেওয়া যাক। সূত্র ঃ 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন', হায়দ্রাবাদ।

খাদ্যগুণ	সমগ্র ডিমে	সাদা অংশে	কুসুমে
ক্যালরি (KCal)	৭৫	১৭	৫৯
প্রোটিন (গ্রাম)	৬.২৫	৩.৫২	২.৭৮
লিপিড (গ্রাম)	৫.০১	০	৫.১২
শর্করা (গ্রাম)	০.৬	০.৩	০.৩
ফ্যাটি অ্যাসিড (গ্রাম)	৪.৩৩	০	৪.৩৩
স্যাচুরেটেড ফ্যাট (গ্রাম)	১.৫৫	০	১.৫৫
মোনো আনস্যাচুরেটেড	--	০	১.৫৫
ফ্যাটি অ্যাসিড (গ্রাম)	১.৯১	০	১.৯১
পি.ইউ.এফ.এ (গ্রাম)	০.৬৮	০	০.৬৮
কোলেস্টরল (মিলিগ্রাম)	২১৩	০	২১৩
থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	০.০৩১	০.০০২	০.০২৮
রাইবোফ্লোবিন (,,)	০.২৫৪	০.১৫১	০.১০০
নিয়াসিন (,,)	০.০৩৬	০.০৩১	০.০০৫
ভিটামিন বিড (,,)	০.০৭০	০.০০১	০.০০৬৯
ফোলেটস (মাইক্রোগ্রাম)	২৩.৫	১	২২.৫

খাদ্যগুণ	সমগ্র ডিমে	সাদা অংশে	কুসুমে
ভিটামিন বি ১২ (,,)	০.৫০	০.০৭	০.৪৩
ভিটামিন এ (আই.ইউ.)	৩১৭.৫	০	৩১৭.৫
ভিটামিন ই (,,)	০.৭০	০	০.৭০
ভিটামিন ডি (,,)	২৪.৫	০	২৪.৫
কোলিন (মি.গ্রা)	২১৫.১	০.৪২	২১৪.৬
বায়োটিন (মাইক্রোগ্রাম)	৯.৯৮	২.৩৪	৭.৫৮
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা)	২৫	২	২৩
আয়রন (মি.গ্রা)	০.৭২	০.০১	০.৫৯
ম্যাগনেসিয়াম (মি.গ্রা)	৫	৪	১
কপার (,,)	০.০০৭	০.০০২	০.০০৪
আয়োডিন (,,)	০.০২৪	০.০০১	০.০২২
দস্তা (,,)	০.৫৫	০	০.৫২
সোডিয়াম (,,)	৬৩	৫৫	৭
ম্যাঙ্গানিজ (,,)	০.০১১	০.০০১	০.০১২

- ২০০০ সালের ব্যাপক মহামারী ও মৃত্যুর পর আবার ইবোলা (Ebola Hemorrhagic Fever) মহামারীর প্রকোপে পশ্চিম উগান্ডার গ্রাম ও জনপদ থেকে মানুষ পালাচ্ছে। ভাইরাস ঘটিত এই রোগের চিকিৎসা নেই। ইতিমধ্যে বহু মৃত্যু ঘটে গেছে।
- পশ্চিমবঙ্গের তরাইয়ের চা-বলয়ে চা বাগানগুলি রুগ্ন বা বন্ধ হয়ে পড়ায় জনজীবন বিশেষত মদেশিয়া চা-শ্রমিকদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনাহার, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যক্ষ্মা, ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া সহ সংক্রামক ব্যাধি, কর্মহীনতা, বাসস্থানের অভাব পরিবারগুলিকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেছে। কাজ দেবার নাম করে যুবতী ও কিশোরীদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পতিতালয়ে। UNICEF, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন NGO-র রিপোর্টে বলা হয়েছে ঢেকলাপাড়া, মুজনাই, কুমলাই প্রভৃতি চা-বাগানে যক্ষ্মায় এবং অনাহার অপুষ্টিতে মারা গেছেন বহু শ্রমিক ও তাদের পরিবার। উঠে আসছে সাঙ্ঘাতিক সব তথ্য। ১২টি চা-বাগান থেকে গত একবছরে ৩,৫০০ বালক বালিকা পাচার হয়ে গেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবনে এসিড বৃষ্টি হবে

বিবর্তন ভট্টাচার্য্য

বাংলাদেশের খুলনা ডিভিশনের বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হলে সুন্দরবন ও সংলগ্ন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর ক্ষতি হবে ভয়াবহ। এই প্রকল্পটি ভারতের মধ্যপ্রদেশে করা যায়নি সে দেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে। অথচ বাংলাদেশে এই জনবিরোধী বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে যাচ্ছে সরকার। জাতীয় প্রেসক্লাবে আটটি সংগঠন আয়োজিত রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রভাব শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ বক্তব্য দেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহবায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

সংবাদ সম্মেলনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রমেন্ট সায়েন্স ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ হারুন তাঁর গবেষণাপত্র তুলে ধরে বলেন, সুন্দরবনের পাশে বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের ভূগর্ভের উপরিভাগ ও ভূ-অভ্যন্তরের পানি নষ্ট হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে ওই অঞ্চলে এসিড রেইন (অম্লবৃষ্টি) হতে পারে। এমনকি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাবে। লবণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধ্বংস হবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঢাল সুন্দরবন।

শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম ধরা হয়েছে প্রতি ইউনিট ৮টাকা। কিন্তু কয়লার দাম বাড়লে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১৪টাকারও বেশি হবে। আমরা শুধু সুন্দরবন হারাব তাই নয়, অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হব। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ক্ষতিকারক হওয়ায় ভারত মধ্যপ্রদেশে এরকম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে দেয়নি যে কোম্পানিটিকে, সেই এনটিপিসি (ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন) কিভাবে বাংলাদেশের সুন্দরবন ধ্বংস করে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির নির্বাহী প্রধান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, গত ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পরিবেশগত প্রতিবেদন দেওয়ার আগে এই প্রকল্পের সব কার্যক্রম বন্ধ রাখা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেন, আশা করি সরকারের মধ্যে যাঁরা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, এরকম ভয়ঙ্কর প্রকল্প থেকে সরে আসার জন্য তাঁরা সরকারকে বোঝাবেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে 'বাপা'র সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিন বলেন, বাংলাদেশে তাপভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করার কোনো পরিবেশ নেই। আমরা এ ধরণের বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিরোধিতা করছি। সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য দেন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি এ. এস. এম. শাহজাহান ও প্রকৌশলী ম. এনামুল হক। উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার শেখ মো. জাকির হোসেন, সুশান্ত দাস প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক ৮টি সংগঠন হচ্ছে - বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ,ট্রান্সপারেন্সি ইন্টরন্যাশনাল বাংলাদেশ (টি.আই.বি), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস মুভমেন্ট, সেভ দ্য সুন্দরবন ফাউন্ডেশন, কৃষিজমি রক্ষা কমিটি, বাগেরহাট উন্নয়ন কমিশন ও গ্রিনভয়েস। জানা যায় রামপালে সুন্দরবনের কাছে এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে গত ২৯শে জানুয়ারি'১১ ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছে সরকার। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানির (এনটিপিসি) সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) এ চুক্তি করে। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশের ছাড়পত্র ছাড়াই জমি অধিগ্রহণ ও নদী ভরাটের কাজ করেছে পিডিবি। এর বাইরে কয়লা রাখার জন্য আরো ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এই কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে।

হুগলি জেলার বলাগড়ে যে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রস্তুত করবার জন্য ৫কিমি রেডিয়াস চড়ে একটি তাপ বিদ্যুৎ তৈরীর পরিকল্পনা করেছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (সি ই এস সি) তা ওই অঞ্চলের প্রায় ১০০০ মৎসজীবী ও ৩০০ কৃষিজীবীদের সাথে নিয়ে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আন্দোলন সংগঠিত করে বন্ধ করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশে রামপালে যে তাপ বিদ্যুৎবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে তার সমর্থন চেয়ে ওই দেশের পরিবেশকর্মীগণ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছে। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার একদল বিজ্ঞানকর্মী এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে বাংলাদেশ যাবে। পশ্চিবাঙলার দিকে সুন্দরবনের আশেপাশে যেসব পরিবেশ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীগণ আছেন সুন্দরবন রক্ষার্থে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান।

আর্সেনিক-ভীতি ছড়িয়ে কার লাভ?

শঙ্কর রায়

আর্সেনিকোসিস আমাদের রাজ্যের গুরুতর এক সামাজিক সমস্যা। সর্বস্তরে সুষ্ঠ পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, সরকার থেকে নাগরিকের উদ্যোগ সমষ্টিগতভাবে লড়াই চালিয়ে একে মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিকার ও প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে। বিদেশী অর্থ নিয়ে, দৈনিক বাজার পত্রিকার সবজান্তা সাংবাদিককে দিয়ে জনমানসে আতঙ্ক ছড়ানোটা কোন কাজের কাজ নয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকর রায় এই দিকটি তুলে ধরেছেন। — সম্পাদকমণ্ডলী

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কেন পূর্ব ভারতে

কল্যাণ রুদ্র

পরিবেশ-প্রকৃতির সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ আসলে ক্ষমতা ও আধিপত্যের পরম্পরা — শাসিতের উপর শাসকের বিধিনিষেধের পরিকল্পিত প্রয়োগ। ঐতিহাসিক ডোনাল্ড ওরস্টার তাঁর *রিভারস অব এম্পায়ার* গ্রন্থে লিখেছেন— জলসম্পদের উপর দখলদারি আসলে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল। এ সত্য সকলেই জানেন, শুখা এলাকার মানুষের কাছে জল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকার উপাদান। জল প্রকৃতিজ, রাজনৈতিক সীমা-নিরপেক্ষ এবং গতিশীল। জল সম্পদ বলেই ভুবনীকরণের উদাত্ত আহ্বানে আজ পণ্য, আর বাকি সব আগ্রাসনের রাজনীতির মতোই এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরেও চলছে দখলের লড়াই। গঙ্গার জলের ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মতান্তর চলছে সেই ১৯৭০-এর দশক থেকে। কাবেরী নদীর জল নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বিবাদে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। শুখা মরশুমে গঙ্গার জল টেনে নেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের কৃষিজমিতে, শুকিয়ে যায় গঙ্গার নিম্ন-প্রবাহ। ডিভিসি-র জল মূলত পান বর্ধমানের কৃষকরা। বঞ্চিত হুগলি ও হাওড়া জেলার কৃষকরা। এইভাবেই চলছে জল নিয়ে বিবাদ। গত শতাব্দীতে তেলের জন্য যুদ্ধ হয়েছে, এই শতাব্দীতে জলের জন্য যুদ্ধ হবে — এমন আশঙ্কা বিশ্বব্যাঙ্কের। পৃথিবী ক্রমশ আরোও উষ্ণ হচ্ছে, অনেক এলাকায় জলের সংকট আরো গভীর হচ্ছে। এইসময় শুরু হয়েছে জলসম্পদ লুণ্ঠনের নতুন কৌশল-প্রকৌশল যার নাম ভারচুয়াল ওয়াটার ট্রেড। আমেরিকা - ব্রিটেনের মতো দেশ চাইছে যেসব ফসল উৎপাদনে বেশি জল লাগে সেগুলির চাষ হোক তৃতীয় বিশ্বে, তারপর রফতানি হোক উন্নত দুনিয়ায়। ফসলের সঙ্গেই রফতানি হয়ে যাবে জলসম্পদও। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এক টন সাধারণ চাল বিদেশে রফতানি হলে তার সঙ্গে ২৮.৫০ লক্ষ লিটার জলও চলে যায়। সেচের যে জল আমরা মাটির নীচ থেকে টেনে তুলছি তা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ হচ্ছে না। মাটির নীচের জল আমাদের সর্বোত্তম উত্তরাধিকার। অলক্ষেই লুঠ হয়ে যাচ্ছে সেই সম্পদ। শুকিয়ে যাচ্ছে বহু নদী-যা হাজার বছর ধরে আমাদের সভ্যতাকে লালন করেছে। এ সব হচ্ছে উন্নয়নের বকলমে। তবে মুখ আর মুখোশ চেনা মুস্কিল।

এই লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে, প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময়। প্রথম সবুজ বিপ্লব ছিল উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বড় জলাধার - খালের নেটওয়ার্ক, মাটির নীচ থেকে জল তোলার প্রকৌশল ইত্যাদি মিলে একটি প্যাকেজ। উল্লেখ্য, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে ভারত খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ধীরে ধীরে পাঁচ কোটি টন থেকে ২৩ কোটি টন অতিক্রম করেছে। ওই সময় ভারতে সেচসেবিত এলাকার ব্যাপ্তি ২.২ কোটি হেক্টর থেকে বেড়ে ১০ কোটি হেক্টর অতিক্রম করেছে। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্ব কতটা সেচ ব্যবস্থার আর কতটা উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি ভূ-জীববৈচিত্রের ক্ষতির পরিমাণও। উল্লেখ্য, ওই সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫২২ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১৮৬০ কিলোগ্রাম হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন ৩.৫৬ গুণ বাড়াতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বেড়েছে ৩.৪৪ গুণ।

এমন অবস্থায় ভারত সরকারের ২০১০-১১ সালের বাজেটে পূর্ব ভারতের ৬টি রাজ্যে দ্বিতীয় বা চিরসবুজ বিপ্লবের প্রস্তব করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। সরকার বলছে - India needs another green revolution if it wants to position itself as one of the world's major food exporters and not merely content feeding 17 per cent of the global population on only 3 per cent of the world's arable land.

এবার আমরা আস্তে আস্তে প্রসঙ্গে যাব। প্রথমেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে মিল ও অমিল খুঁজে নেওয়া যাক :

	প্রথম সবুজ বিপ্লব	দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব
অঞ্চল	উচ্চ-গঙ্গা সমভূমি (হরিয়ায়া, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ)	নিম্ন-গঙ্গা সমভূমি (বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা)
প্রযুক্তি	উচ্চফলনশীল বীজ, রায়ায়নিক সার, কীটনাশক, বড় বাঁধ ও মাটির নীচের জল-নির্ভর সেচ	জিন-পরিবর্তিত বীজ
নেপথ্যের	রকফেলার ও ফোর্ড ফাউন্ডেশন্	মনস্যান্টো, ওয়ালমার্ট, আর্চার ডানিয়েলস, মিডল্যান্ড
বৈশিষ্ট্য	দেশজ বীজের বদলে বদল উচ্চফলনশীল বীজ	জিন-পরিবর্তিত বীজ
ফল	ভূ-জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতি	জিন-পরিবর্তিত ফসলের সঙ্গে পরাগ মিলনে দেশজ ফসল ধ্বংস। কৃষকের বীজের অধিকার হারানো। জীব বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি। জলসম্পদ লুণ্ঠন। বহুজাতিকের একাধিপত্য।

সেচের চালচিত্র ঃ দশম পরিকল্পনায়-ভারতের সেচ এলাকা যতটা বৃদ্ধি পাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল বাস্তবে তা হয়নি। লক্ষ্য ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক থেকে গেছে প্রায় ৩৬% অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ৬৪% জমিতে সেচের জল পৌঁছেছে। আরো যা নজর করার তা হল, ভারত সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য দেশের প্রায় ১৪ কোটি হেক্টর জমিতে সেচের

জল পৌঁছে দেওয়া, দশম পরিকল্পনায় এই লক্ষ্য ছিল ১০.২৮ কোটি হেক্টর জমি। কিন্তু দেওয়া গেছে মাত্র ৮.৭২ হেক্টর জমিতে। এই জমির প্রায় ৪৭% এলাকায় সেচ করা হয় মাটির নীচের জল তুলে। দু-কোটির বেশি নলকূপ এই জলের জোগান দিচ্ছে। সরকারি প্রতিবেদনে দেশ জুড়ে যে বেসরকারি সেচ-ব্যবস্তা গড়ে উঠেছে তার হিসেব থাকে না। এদেশে সারা বছরে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের ১৫%-র ফলনের জন্য ফি বছর মাটির এমন গভীর স্তর থেকে জল তুলে আনা হয় যা সহজে পূরণ হবার নয়। ইতিমধ্যেই দেশের ১৫% ভূগর্ভে জলাধার বিপন্ন, আগামী ২৪ বছরে দেশের ৬০% মাটির নীচের জলাধার শুকিয়ে যাবে।

বড় বাঁধের লাভক্ষতি ঃ

ভারতীয়দের চোখে নদী হল মা, যার পলি ও জল এদেশের কৃষির মূল উপাদান। আপাত-বিধ্বংসী বন্যাও এখানে বয়ে আনে সৃষ্টির বার্তা। কৃষি জমিতে নতুন পলি ফেলে বন্যার জল নেমে গেলে কৃষকরা চাষ শুরু করতেন। কোনো রাসায়নিক সার ছাড়াই প্রচুর ফলন হত। ব্রিটিশরা আসার পর এদেশের নদী-জল-পলির এই অন্তঃসম্পর্কটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পর শুরু হল বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ। বড় বাঁধের লাভক্ষতি নিয়ে পৃথিবীজোড়া বিতর্কের অন্ত নেই। বহু যুগ ধরেই মানুষ চেষ্টা করেছে বর্ষার জল সংরক্ষণ করে শুখা মরশুমে সেচের জল হিসেবে ব্যবহার করতে। পরে সংরক্ষিত জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো, মৎস চাষ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে বাঁধগুলি ছিল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ছোট, পরে বাঁধের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হুভার বাঁধ আজও নির্মাণ-প্রকৌশলের বিস্ময়, বলা হয় ওই বিশাল বাঁধটি চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বাঁধ নির্মিত হয়। ওই ২০০৯ সালে নির্মিত চিনের থ্রি গর্জেস ড্যাম বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার যা ৪০০০ কোটি ঘনমিটার জল ধারণ করতে পারে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর চোখে বড় বাঁধ ছিল উন্নয়নের প্রতীক। তিনি ভেবেছিলেন "বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়"। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ধাক্কায় জাতীয় অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। দেশজোড়া খাদ্যসংকট সামাল দিতে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে গম আসছে কিন্তু সবার ক্ষুধা মিটছে না। সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে হবে আর সেইজন্য চাই সেচ-ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পরেই ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নের ধারা মেনে শুরু হল নদী-শাসনের এক নতুন যুগ। টেনিসি প্রকল্পের অনুসরণে ডিভিসি ছাড়াও তৈরি হল ভাকড়া-নাঙাল ও হিরাকুঁদ। দেশজুড়ে বহু নদীর বহমান ধারাকে বন্দি করে তৈরি হল ৪ হাজারের বেশি বড় বড় বাঁধ। প্রায় সবার অলক্ষে জলাধারের নীচে তলিয়ে গেল অন্তত চারকোটি মানুষের বাস্তুভিটে। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে জলধারের নীচে যত জমি তলিয়ে গেছে তার মোট আয়তন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তনের প্রায় সাত গুণ। ভারতে জলাধার নির্মাণের জন্য যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই জনজাতি বলা যায়। তাঁরা কথাকথিত উন্নয়নের বলি। ১৯৪৮ সালে ওড়িশার হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশ্যে নেহেরু বলেছিলেন, আপনাদের দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে হবে। ১৯৪৮ সালে নেহেরুর পাশে দাঁড়িয়ে যে জনজাতি রমণী ডিভিসি জলাধারের উদ্‌বোধন করেছিলেন তাঁর কথাও কেউ মনে রাখেননি। নেহেরুর সহকর্মী মোরারজি দেশাই-এর উক্তি আরো নির্মম। ১৯৬১ সালে হিমাচল প্রদেশের বিপাশা নদীর উপর একটি বাঁধের নির্মাণকালে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের দেশাই বলেছিলেন — জলাধারটি নির্মিত হলে আমরা আপনাদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলব। যদি আপনারা চলে যান তো ভালো, অন্যথায় আমরা জল ছেড়ে আপনাদের ডুবিয়ে দেব। শুধু মানুষেরই ক্ষতি হয়েছে এমন নয়, জলাধারের নীচে তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র। বাঁধ নির্মাণের পর একদিকে যেমন জলাধারে ক্রমাগত পলি জমেছে, অন্যদিকে ভাটির দিকে নদীখাত ক্রমাগত শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাঁধ থেকে ছাড়া উদ্বৃত্ত জলে ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এসব ঘটনা উন্নয়নের রূপকারদের মনে কোনো দাগ কাটেনি। দি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন লার্জ ড্যাম -এর পূর্বতন প্রেসিডেন্ট থিও ভ্যান রোবরোইক'[১] বলেছিলেন — We need large dams and we are not going to apologize for it. Those in the developed countries, who already have everything put stambling blocks in our way from the comfort of their electrically lit and air conditioned homes ... The third world is not ready to give up the construction of large dams, as much for water supply and flood control as for power... Hydropower is the cheapest and cheanest source of energy, but environmentalists don't appreciate that. Certainly large dam projects create local resettlement problams, but this should be a matter of local not international concern.

রোবরোইক-এর উক্তি প্রসঙ্গে অন্য কিছু কথাও বলা প্রয়োজন। প্রথমেই আসা যাক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে। সব জলাধারের ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জলাধারে সাধারণত তিনটি স্তরে জল রাখা হয়। নীচে স্তরটির নাম ডেড স্টোরেজ, যেখানে পলি জমে এবং ওই জল ব্যবহার করা যায় না। মধ্যবর্তী স্তরটির নাম লাইভ স্টোরেজ — যেখানে সেচের জল সংরক্ষণ করা হয়। জলাধারের একেবারে উপরের স্তরে অতিবৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ জুলাই-আগস্ট মাসে জলাধার পূর্ণ করে রাখে, কারণ সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি অনিশ্চিত — হতে পারে না বা নাও হতে পারে। হলে, পূর্ণ জলাধার থেকে উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন ছাড়া জল আর ভাটি এলাকার বৃষ্টির জল মিশে বড় বন্যা ডেকে আনে, যেমন ঘটেছিল ১৯৭৮ ও ২০০০ সালে। আরও একটি কথা হল, একই জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজ করা যায়

না। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধার থেকে ক্রমাগত জল ছাড়তে হয়, ফলে সেচের জল বৃষ্টির জল শুখা মরশুম পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় না। বর্তমানে ডিভিসি যে শক্তি উৎপাদন করে তার প্রায় ৯৫% তাপবিদ্যুৎ। জীবনের শেষ পর্বে বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তিমন্ত্রকের বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন— আমরা এক লোক দেখানো বৃহদায়তন প্রকল্প নির্মাণের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে আর সেই পথেই দেশের বৃহত্তর মঙ্গল। তাঁর সেই অনুধাবন উত্তরসুরিদের প্রভাবিত করে নি। তারপরও তৈরি হয়েছে অনেক বাঁধ। নানা প্রকল্পে টাকার জোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আর সেই বিপুল ঋণ সুদসহ শোধ করছে দেশের ধনী -দরিদ্র সবাই।

আজ সরকারি প্রতিবেদনেও[২] স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আর এত মানুষের চোখের জলে নির্মিত বড় বাঁধগুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জলাধারে সংরক্ষিত জলের বেশিরভাগই বাষ্পীভূত হয়েছে বা খালের নীচের মাটি টেনে নিয়েছে, মাত্র ৩৮-৪০ শতাংশ জল সেচের কাজে লেগেছে। এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার থেকে। সেচের জলের জোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভ-জলের ভাণ্ডার আজ অনেকে স্থানেই রিক্ত। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে, ২০০২-২০০৮ জালের মধ্যে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ১০৯ ঘন কিমি জল মাটির নীচ থেকে তোলা হয়েছে। নিবন্ধটির লেখকরা বলেছেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ওই এলাকার প্রায় ১১.৪০ কোটি মানুষ জলাভাবে বিপন্ন হবেন।

একদা-সুজলা-সুফলা বাংলার কথা ঃ

একদা জলসিক্ত বাংলার কৃষি-অর্থনীতি আজ বিপন্ন। ২০১০ সালের বর্ষাকালে রাজ্য কৃষি দফতর বলছে, দক্ষিণবঙ্গে প্রায় এক তৃতীয়াংশের কম বৃষ্টি হয়েছে, সেই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাটির নীচ থেকে জল তুলে। তবু ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে খরিফ চাষ হয়নি। জলাভাবে আরো ৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ করা যাবে না। হাজার বছর ধরে মাটির নীচে সঞ্চিত সেই জলভান্ডার আজ একাধারে রিক্ত ও বিষাক্ত। বিপন্ন আমরা ও আগামী প্রজন্ম। আমাদের পূর্বজরা মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা বিপুল জলসম্পদের সন্ধান পেয়েও সেই জল ব্যবহার করতেন পরিমিতভাবে। কারণ তাঁরা জানতেন, মাটির নীচের জলসম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলনের প্রতিক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী আঘাত লাগবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের নানা স্তরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে অপ্রতিহত গতিতে, একই সঙ্গে বেড়েছে জলের চাহিদা। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভেঙে যায় সব সামাজিক বিধিনিষেধ। নলকূপের পাইপ ক্রমশ পৌঁছে যায় মাটির গভীরতর স্তরে। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে প্রবেশ করে, তার তুলনায় অনেক বেশি জল তোলার ফলে ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে, হাজার বছর ধরে জমা জলভাণ্ডার। এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের প্রায় সর্বত্র, ব্যতিক্রম নয় একদা সুজলা-সুফলা বাংলাও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদ জানিয়েছে, রাজ্যের ১৩টি জেলায় মাটির নী জলস্তর যে হারে নামছে তা গভীর উদ্বেগের কারণ। কালো তালি নাম উঠেছে ৬৮ টি ব্লকের। অনেক সহ্য করে প্রকৃতি এখন জা দিচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, পলিস্তরে সঞ্চিত থাকা ফ্লোরাইড ও আর্সে সক্রিয় হয়ে বিষাক্ত করে দিচ্ছে নীচের জল আর সেই জল পান ক প্রায় দু-কোটি মানুষ।

কিন্তু কেন এমন হল? পশ্চিমবঙ্গের জলচক্রের ছবিটা এবার জে নেওয়া যাক। এই রাজ্যে বৃষ্টিপাতের সময় ও স্থানগত বৈষম্য লক্ষণী কোচবিহার জেলায় বছরে প্রায় ৩২৭২ মিমি বৃষ্টি হয়। পুরুলিয়াতে ১৫০৭ মিমি। রাজ্যের ১৯টি জেলার গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৬২ মি এই বৃষ্টির ৭৫% বর্ষার চার মাসে হয়ে যায়। সেই সময় উদ্বৃত্ত জ তারপর দীর্ঘ আটমাসের অনাবৃষ্টি বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। গত দশকের গড় করলে দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে বছরে হয়েছে যথাক্রমে ৮৮ ও ৭৯ দিন। প্রকৃতির বদান্যতায় আমরা প্রতি ব যে জল পাই তার পরিমাণ হল ১২.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। থেকেই ৩.৪২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাটির নীচে প্রবেশ করে ত ৮.০৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার বাষ্পাভবন ও বাষ্পমোচনের মাধ্যমে বাত ফিরে যায়। বলা প্রয়োজন, এ রাজ্যের মাত্র ১৩ শতাংশ এলাকা বনাঞ্চ আর প্রায় ৬২ শতাংশ এলাকা কৃষিজমি। ফলে বাষ্পীভবনের মূল ত হল সেচের জল। আরও একটি বিষয় হল গঙ্গা, দামোদর, অজয়, ময়ূরা তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা ইত্যাদি নদী প্রায় ৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার রাজ্যের বাইরে থেকে বয়ে আনে। এই জলস্রোতের প্রায় ৮০ শত চলে যায় বর্ষার চার মাসে। অন্য সময় নদীয় শুকিয়ে যায়। নদীর পানীয় হিসেবে শুধু শহরাঞ্চলের কিছু ভাগ্যবান মানুষ ব্যবহার করে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামে থাকেন। তাঁদের পাণীয় আসে মাটির নীচ থেকে।

আমাদের জলের চাহিদা নানা ধরনের। ২০০১ সালে আমরা স বছরে যত জল ব্যবহার করেছিলাম তার ৭২ শতাংশ হল সেচের জ পানীয় জল ও গৃহস্থালির চাহিদা ছিল কৃষির তুলনায় অনেক কম মাত্র দুই শতাংশ। শিল্পের চাহিদাও মাত্র ২.৪৯ শতাংশ। সব ক্ষেত্র মিলি ওই বছর জলের মোট চাহিদা ছিল ১০.৬১ মিলিয়ন হেক্টর মিট ২০১১ ও ২০২১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ও হবে যথাক্রমে ১২.০৫ ১৪.৩২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। অর্থাৎ আগামী কয়েক বছরের ম আমাদের জলের চাহিদা জোগানকে অতিক্রম করবে। জলের এই সংক সূচনা হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায়, যখন সবুজ ছোঁয়ায় দে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এ রাজ্যের কৃষির প্রকৌশলও আমূল বদ গেল। আগে কৃষকরা ফসল নির্বাচন করতেন জলের প্রাপ্যতা অনুসা শুখা মরশুমে এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টির এলাকায় এমন ফসলের হত যাতে জল কম লাগে। সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে খাদ্য সুরক্ষ অজুহাতে শুরু হল অন্য ধরনের চাষ, দেশজ বীজের বদলে এল ন বীজ, যার জলের চাহিদা অনেক বেশি। শুরু হল শুখা মরশুমে বো ধানের চাষ। যে সময় বোরো চাষ হয় (জানুয়ারি-এপ্রিল) সেই স

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয় মাত্র ১২৫ মিমি অথচ ওই চাষের সেচের জন্য প্রয়োজন ১৫০০ মিমি জল। অন্যভাবে বলা যায়, এক কিলোগ্রাম বোরো ধান উৎপাদনে ৪৮০০ লিটার জল লাগে, যার প্রায় সবটাই টেনে তোলা হয় মাটির নীচ থেকে। অনেকেই জানেন না বোরো ধান উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ জল খরচ হয়, তা দিয়েই দ্বিগুণের বেশি গম উৎপাদন করা যায়। এখন দক্ষিণ-বঙ্গের অনেক এলাকাতেই শুখার সময় অগভীর নলকূপ কাজ করে না। প্রকৃতি এখন দেউলিয়া, ফলে গভীর সংকটের মুখোমুখি রাজ্যের কৃষি-অর্থনীতি।

জলের বেসরকারিকরণ ঃ

বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে ভারতে যেভাবে জল-ব্যবস্থাপনা চলছে তা সুস্থায়ী নয়-জলের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নাকি ভঙ্গুর। তারা বলছে ভারতের জল-ব্যবস্থাপনা যেভাবে চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ বা এখনকার বাঁধ-জলাধার-সেচখাল ইত্যাদির দেখভালের জন্য, এমন কী সমাজ অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের হাতে থাকবে না। তাই চাই জল ব্যবস্থাপনার বেসরকারিকরণ। ২০০২ সালে ঘোষিত জাতীয় জলনীতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক-এর পরামর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। নতুন জলনীতির সব থেকে উদ্বেগজনক অংশ হল জল-ব্যবস্থাপনার বেসরকারিকরণের প্রয়াস। একদিকে যেমন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে বেসরকারি উদ্যোগ ও কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টকে স্বাগত জানানো হয়েছে। ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বহুজাতিক সংস্থার মিলিত উদ্যোগে এক সোনার পাথরবাটি তৈরির চেষ্টা। বিশ্বব্যাঙ্ক পরামর্শ দিচ্ছে, উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে আরও বড় বাঁধ নির্মাণের, অর্থের জোগান দেবে তারাই। জাতীয় জলনীতির এক অববাহিকার জল, অন্য অববাহিকায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারত সরকার ঘোষণা করেছে ২০১৬ সালের মধ্যে তারা দেশের সব নদীগুলিকে জুড়ে দিতে চায় **। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর জল নিয়ে যাওয়া হবে দক্ষিণ ভারতের খরা-প্রবণ এলাকায়। এই প্রকল্পে প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৫.৬০ লক্ষ কোটি টাকা যা স্বাধীনতা-উত্তর ছয় দশকে সেচখাতে মোট ব্যয়ের দশগুণ। এই প্রকল্পেও টাকার জোগান দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক, তারপর জল পরিণত হবে চড়া দামের পণ্যে। কারণ জাতীয় জলনীতিতে বলা হয়েছে, এবার জলের দাম এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে প্রকল্পে নিয়োজিত অর্থ ও ব্যবস্থাপনার খরচ উঠে আসে। প্রথানুগ দেশীর জল-সংস্কৃতির রূপ-নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ তামাদি বলে চিহ্নিত করে নতুন জলনীতি রচিত হয়েছে। যেখানে প্রকৌশল-ঔদ্ধত্যে বলা হয়েছে এক নতুন জল-সমাজ তৈরির কথা। জলের প্রাকৃতিক বৈষম্য মুছে, সমতা আনার এক অলীক স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। শাসকরা বিলক্ষণ জানেন, শুধু জলের আশ্বাস শুখা এলাকার ভোটের অঙ্ক বদলে দিতে পারে আর সেই মতোই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জল এবার যাবে তামিলনাড়ু। অথচ অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে জলাধার ও কৃষিজমির মধ্যে দূরত্ব যত বাড়ে, জলের অপচয় তত বেশি হয়। কৃষিজমির একাংশ বা কাছে কোথাও জল সংরক্ষণ করাই শ্রেয়। এজন্য বিদেশী প্রযুক্তি লাগে না, স্বয়ংসম্পূর্ণ জল-ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দেশজ জ্ঞানই যথেষ্ট। মূলধনের প্রয়োজনও ন্যূনতম। রাজস্থানের ঊষর অঞ্চলে গড়ে ওঠা দেশজ জলসংরক্ষণ পদ্ধতি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতি জাতীয় জলনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। জল বিকল্পহীন অবিভাজ্য সম্পদ। বিশ্বায়নের আহ্বানে সেই সম্পদ বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত হবে এটাই এখন স্বাভাবিক।

অন্তর্নিহিত জলের স্থানান্তর ঃ

ফসল বা কোনো পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সময় যে পরিমাণ জল খরচ হয় তাকে বলা হয় অন্তর্নিহিত জল, ইংরেজিতে ভারচুয়াল ওয়াটার। ১৯৯৭ - ২০০১ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সময় নানা পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ১৬২৫ ঘন কিলোমিটার জল স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই জল গঙ্গা নদী দিয়ে এক বছরে বয়ে যাওয়া জলের তিন গুণেরও বেশি। ১৯৯৫-৯৯ সালে ভারত থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯১.৮০ কিলোমিটার জল আর ওই একই সময়ের মধ্যে আমদানি দ্রব্যের সঙ্গে ভারতে ঢুকেছিল ১৯.৫০ ঘন কিলোমিটার জল, অর্থাৎ আমরা হারিয়েছিলাম ১৭২.৩০ ঘন কিলোমিটার জল। অন্তর্নিহিত জল বা ভারচুয়াল ওয়াটার কথাটির অর্থ এমন নয়, যে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সব জল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় অনেকটাই উৎসে ফেরে না।

যেসব দেশের জলের প্রাকৃতিক জোগান চাহিদার তুলনায় কম তারা যেসব ফসল বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বেশি জল লাগে সেগুলি আমদানি করে জলের চাদিহা কমাতে পারে। বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত জলের আমদানি হল জল সংরক্ষণের অত্যাধুনিক কৌশল। অনেক সময় ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এমনকী স্থানীয় মানুষদের প্রতিরোধের জন্যও এক স্থানের জল অন্যত্র নেওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্নিহিত মাটির নীচের জল অন্যত্র চলে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের খরাপ্রবণ দেশগুলি এখন তাদের জলের সংকট মোকাবিলা করছে অন্তর্নিহিত জল আমদানি করে।

কোনো দেশের বাৎসরিক জলের চাহিদা বা ব্যবহার হিসেব করার এক পদ্ধতি হল ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট বা জলের পদচিহ্ন। কোনো দেশের নাগরিকরা সারা বছরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যত জল ব্যবহার করেন তাকে বলা হয় ওই দেশের জলের পদচিহ্ন। ১৯৯৭-২০০১ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ যত জল ব্যবহার করেছিলেন, তার পরিমাণ ৭৪৫০ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ একজন নাগরিকের ব্যবহৃত জলের বাৎসরিক পদচিহ্ন ছিল ১২৪০ ঘনমিটার। ভারতের নাগরিকদের জলের বাৎসরিক পদচিহ্ন ৯৮৭ ঘন কিলোমিটার, একজনের ৯৮০ ঘনমিটার। তুলনামূলকভাবে মার্কিন নাগরিকের ২৪৮০ ঘনমিটার। জলের পদচিহ্নে কিছু অংশ বাহ্যিক কিছু অংশ অভ্যন্তরীণ, আমাদের খাদ্যশস্য ও ব্যবহৃত পণ্যদ্রব্যের যে অংশ দেশের ভিতরে উৎপন্ন হয় এবং ওই দ্রব্য উৎপাদনে যে পরিমাণ জল লাগে তার মোট পরিমাণ হল অভ্যন্তরীণ পদচিহ্ন। আর যেসব দ্রব্য ও শস্য আমদানি করা হয় তার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত মোট জল হল বাহ্যিক পদচিহ্ন। ভূ-উষ্ণায়নের ফলে যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে জলের সংকট গভীর হচ্ছে, তখন উন্নত দেশগুলি চাইছে অভ্যন্তরীণ পদচিহ্ন কমিয়ে বাহ্যিক পদচিহ্ন বাড়াতে যাতে দেশের ভিতরের জল সংরক্ষণ করা যায়।

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব কেন পূর্ব ভারতে ঃ

নিম্ন-গঙ্গা সমভূমি তুলনাহীন উর্বর এবং প্রকৃতির নিয়মেই জলসিক্ত। এমন সমৃদ্ধ এলাকা ভুবনীকরণের কারবারিদের নজর এড়িয়ে যাবে না এটাই স্বাভাবিক। এই এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের টানে বেনিয়ারা বার বার হানা দিয়েছে — সেই অতীত থেকে। সময় বদলেছে, বাজার অর্থনীতি পরিবেশের ভারসাম্য বা আগামী প্রজন্মের স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় গ্রাহ্য করে না, মুনাফাই এখন শেষ কথা। ২০০৩ সালে ভারত সরকার চেয়েছিল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মহানদী অববাহিকা থেকে ১৭৩০০ কোটি ঘনমিটার জল দক্ষিণ ভারতের খরা-প্রবণ এলাকায় নিয়ে যেতে, প্রবল জনমতের চাপে কিছুটা পিছু হটে সরকার এখন কৌশল বদলেছে। এবার পূর্ব ভারতের জল দেশান্তরে যাবে ফসলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে। বহু ব্যবহারে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটি এখন অনুর্বর ও লবণাক্ত, মাটির নীচের জলসম্পদ নিঃশেষ হওয়ার মুখে — এবার চাই নতুন কৃষি-এলাকা। তাই এবার লক্ষ উত্তর-পূর্ব ভারত। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা (ক্যাম্পম্যান ২০০৭) থেকে জানা গেছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিবছর খাদ্যশস্যের বাণিজ্যের সঙ্গে প্রায় ১০৬ ঘনকিমি জলও চলাচল করে। এই জল ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত মোট জলের ১৫%। সব থেকে বেশি জল চলে যায় পাঞ্জাব-হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশে মোট উৎপাদিত গম ও ধানের যথাক্রমে ৫২ ও ৪৮ শতাংশের উৎপাদন হয় পাঞ্জাবে।

প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে দেশের চিরাচরিত কৃষি বদলে, পঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তর প্রদেশের মতো কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় শুরু হয়েছিল ধান, আখ ইত্যাদি এমন ফসলের চাষ, যাতে জল অনেক বেশী লাগে। এছাড়া ছিল গমের চাষ। সেই সময় থেকে উচ্চ গঙ্গা খাল, ভাকড়া-নাঙাল খাল সেচের জলের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হয় মাটির নীচ থেকে জল তোলা। বর্ষায় যতটা জল মাটির নীচে ঢোকে তার থেকে বেশি জল টেনে তোলার ফলে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ভূগর্ভ-জলভান্ডার। যে এলাকাকে বলা হত ভারতের খাদ্যভান্ডার এখন সেই এলাকাই বিপন্ন-রিক্ত। ক্যান্সারে আক্রান্ত বহু মানুষ। ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে আত্মহত্যার মিছিল।

প্রথম সবুজ বিপ্লব যে তিন রাজ্যে সফল বলে দাবি করা হয়েছিল, তার সঙ্গে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তাবিত তিন রাজ্যের কয়েকটি বিষয় তুলনা করলে বোঝা যাবে কেন ভূমির উর্বরতা ছাড়াও জলের প্রাপ্যতা একটি মুখ্য নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। নীচের সারণিতে ওই ৬ রাজ্যের প্রাপ্য জলসম্পদের তুলনা থেকে বোঝা যাবে কেন উত্তর-পূর্ব ভারতকে কর্পোরেট কৃষির জন্য বেছে নিতে চাইছে।

শেষ কথা ঃ

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনা হয়েছে ভারত -মার্কিন জ্ঞানচুক্তি (২০০৫) অনুসারে। জিন-প্রযুক্তি নির্ভর এই পরিকল্পনা দেশের ভূ-জীববৈচিত্র্যের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক তা এই নিবন্ধের বিষয় নয় — আমাদের আলোচ্য বিষয় দেশের বিপন্ন জলসম্পদ। আমাদের দেশের চিরায়ত জলসংরক্ষণের ধারাটি ছিল প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীনতা-উত্তর ছয় দশকে যা ধ্বংস হয়ে গেছে। ২০০১ সালে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণন বলেছিলেন - জলসংরক্ষণের দেশজ ধারাটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার অর্থ, আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিরোধিতা করা নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও দেশজ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে জলসংরক্ষণ করাই আধুনিকতা, তাতেই মানুষের বৃহত্তর মঙ্গল।

জলসম্পদের প্রাপ্যতা ঃ ৬ রাজ্যের তুলনা ঃ

রাজ্য	আয়তন [বর্গকিমি]	জনসংখ্যা [কোটি]	বৃষ্টিপাত [মিমি]	জলের পরিমাণ [ঘন কিমি]	মাথাপিছু জল [ঘন মি/বছরে]	জলের স্থানান্তর [ঘন মি/বছরে]
পাঞ্জাব	৫০,৩৬২	২.৪৪	৫৫০	২৯.৬৯	৩৫৫৪	-২০.০
হরিয়ানা	৪৪,২১২	২.১১	৫১১	২২.৬১	২১৭৬	-১৪.১
উত্তরপ্রদেশ	২৪০,৯২৮	১৬.৬২	৮০২	১৯৩.৩৩	২৯২২	-২০.৮
বিহার	৯৪,১৬৩	৮.৩০	১১৫৪	১০৮.৬৪	৬৮৯৮	১৫.৩-
ঝাড়খন্ড	৭৯,৭১৪	২.৬৯	১০৪১	৯৫.৯৬	৪৫৮০	৯.৩-
পশ্চিমবঙ্গ	৮৮,৭৫২	৮.০২	১৮৪৮	১৬৪.০৫	২০৪৬	***

*** তথ্য জানা নেই। বৃষ্টিপাত ২০০৪-০৮ সালের গড়

[১] Report on Integrated Water Resource Development (1999), Report of the National Commission on Integrated Water Resource Development Vol. 1 (1999)

[২] Comment of Robroek (International Commission on large dam) : Dams and Development / Transitional Struggles for Water and Power by Sanjib Khagram (Oxford)

[৩] নদী জোড়া দেওয়ার পরিকল্পনা — River linking project.

রচনা : জুন ২০১১
ঋণ : ফামা

আন্তর্জাতিক

Why Is Cuba's Health Care System the Best Model for Poor Countries?

Don Fitz

Furious though it may be, the current debate over health care in the US is largely irrelevant to charting a path for poor countries of Africa, Latin America, Asia and the Pacific Islands. That is because the US squanders perhaps 10 to 20 times what is needed for a good, affordable medical system. The waste is far more than 30% overhead by private insurance companies. It includes an enormous amout of over-treatment, creation of illnesses, exposure to contagion through over-hospitalization, disease-focused instead of prevention - focused research, and making the poor sicker by refusing them treatment. [1]

Poor countries simply cannot afford such a health system. Well over 100 countries are looking to the example of Cuba, which has the same 78 year life expectancy of the US while spending 4% per person annually of what US does. [2]

The most revolutionary idea of the Cuban system is doctors living in the neighborhoods they serve. A doctor-nurse team are part of the community and know their patients well because they live at (or near) the *consultorio* (doctor's office) where they work. *Cosultorios* are backed up by *policlinicos* which provide services during off-hours and offer a wide variety of specialists. *Policlinicos* coordinate community health delivery and link nationally-designed health initiatives with their local implementation.

Cubans call their system *medicine general integral* (MGI, comprehensive general medicine). Its programs focus on preventing people from getting diseases and treating them as rapidly as possible.

This has made Cuba extremely effective in control of everyday health issus, Having doctors' offices in every neighborhood has brought the Cuban infant mortality rate below that of the US and less than half that of US Blacks. [3] Cuba has a record unmatched in dealing with chronic and infectious diseases with amazingly limited resources. These include (with date eradicated) : polio (1962), malaria (1967), neonatal tetanus (1972), diphtheria (1979), congenital rubella syndrome (1989), post-mumps meningits (1989), measles (1993), rubella (1995), and TB meningitis (1997). [4]

The MGI integration of neighborhood doctors' offices with area clinics and a national hospital system also means the country responds well to emergencies. It has the ability to evacuate entire cities during a hurricane largely because *consultorio* staff know everyone in their neighborhood and know who to call for help getting disabled residents out of harm's way. At the time when New York City (roughly the same population as Cuba) had 43,000 cases of AIDS, Cuba had 200 AIDS patients. [5] More recent emergencies such as outbreaks of dengue fever are quickly followed by national mobilizations. [6]

Perhaps the most amazing aspect of Cuban medicine is that, despite its being a poor country itself, Cuba has sent over 124,000 health care professionals to provide care to 154 countries.[7] In addition to providing preventive medicine Cuba sends response teams following emergencies (such as earthquakes and hurricanes) and has over 20,000 students from other countries studying to be doctors at its Latin American School of Medicine in Havana (ELAM, *Escuela Latinoamericana de Medicina*).[8]

In a recent *Monthly Review* article, I gave in-depth descriptions of ELAM students participating In Cuban medical efforts in Haiti, Ghana and Peru.[9] What follows are 10 generalizations from Cuba's extensive experience in developing medical science and sharing its approach with poor countries throughout the world. The concepts from the basis of the New Global Medicine and summarize what many authors have observed in dozens of articles and books.

First, it is not necessary to focus on expensive technology as the initial approach to medical care. Cuban doctors use machines that are available, but they have an amazing ability to treat disaster victims with field surgery. They are very aware that most lives are saved through preventive medicine such as nutrition and hygiene and that traditional cultures have their own healig wisdom. This is in direct contrast to Western medicine, especially as is dominant in the US, which uses costly diagnostic and treatment techniques as the first approach and is contemptuous of natural and alternative approaches.

Second, doctors must be part of the communities where they are working. This could mean living in the same neighborhood as a Peruvian *consultorio.* It could mean living in a Venezuelan community that is much more violent than a Cuban one. Or it could mean living in emergency tents adjacent to where victims are housed as Cuban medical brigades did after the 2010 earquake in Haiti. Or staying in a village guesthouse in Ghana. Cuban-trained doctors know their patients by knowing their patients' communities. In this they differ sharply from US doctors, who receive zero training on how to assess homes of their patients.

Third, the MGI model outlines relationships between people that go beyond a set of facts. Instead of memorizing mountains of information unlikely to be used in community health, which US students must do to pass medical board exams, Cuban students learn what is necessary to relate to people in *consultories, polyclinicos,* field hospitals, and remote villages. Far from being nuisance courses, studies in how people are bio-psycho-social being are critical for the everyday practice of Cuban medicine.

Fourth, the MGI model is not static but is evolving and unique for each community. Western medicine searches for the correct pill for a given disease. In its rigid approach, a major reason for research is to discover a new pill after "side effects" of the first pill surface. Since traditional medicine is based on the culture where it has existed for centuries, the MGI model avoids the futility of seeking to impose a Western mindset on other societies.

Fifth, it is necessary to adapt medical aid to the political climate of the host country. This means using whatever resources the host government is able and willing to offer and living with restrictions. Those hosting a Cuban medical brigade may be friendly as in Venezuela and Ghana, be hostile as is the Brazilian Medical Association, become increasingly hostile as occurred after the 2009 coup in Honduras, or change from hostile to friendly as occurred in Peru with the 2011 election of Ollanta Humala. This is quite different from US medical aid, is part of an overall effort to dominate the receiving country and push it into adopting a Western model.

Sixth, the MGI model creates the basis for dramatic health effects. Preventive community health training, a desire to understand traditional healers, the adility to respond quickly to emergencies, and an appreciation of political limitations give Cuban medical teams astouding success. During the first 18 months of Cuba's work in Honduras following Hurricane Mitch, infant mortality dropped from 80.3 to 30.9 per 1,000 live births. When Cuban health professionals intervenced in Gambia, malaria decreased from 600,000 cases in 2002 to 200,000 two years later. And Cuban-Venezuelan collaboration resulted in 1.5 million vision corrections by 2009. Kirk and Erisman conclude that "almost 2 million people throughout the world ... owe their very lives to the availability of Cuban medical services."[10]

Seventh, the New Global Medicine can becomes reality only if medical staff put healing above personal wealth. In Cuba, being a doctor, nurse, or support staff and going on a mission to another country is one of the most fulfilling activities a person can do. The program continues to find an increasing number of volunteers despite the low salaries that Cuban health professionals earn. There is definitely a minority of US doctors who focus their practice in low-income communities which have the greatest need. But there is no US political leadership which makes a concerted effort to get physicians to do anything other than follow the money.

Eighth, dedication to the New Global Medicine is now being transferred to the next generation. When students at Cuban schools learn to be doctors, dentists, or nurses their instructors tell them of their own participation in health brigades in Angola, Peru, Haiti, Honduras and dozens of other countries. Venezuela has already developed its own approach of MID (*medicina integral communitaria, comprehensive community medicine)* which builds upon, but is distinct from, Cuban MGI.[11] Many ELAM students who work in Ghana as the Yaa Asantewaa Brigade are from the US. They learn approaches of traditional healers so they can compliment Ghanaian techniques with Cuban medical knowledge.

Ninth, the Cuban model is remaking medicine across the globe. Though best-known for its successes in Latin America, Africa, and the Caribbean, Cuba has also provided assistance in Asia and the Pacific Islands. Cuba provided relief to the Ukraine after the 1986 Chernobyl meltdown, Sri Lanka following the 2004 tsunami, and Pakistan after its 2005 earthquake. Many of the countries hosting Cuban medical brigades are eager for them to help redesign their own health care systems. Rather than attempting to make expensive Western techniques

available to everyone, the Cuban MGI model helps re-conceptualize how healing systems can meet the needs of a country's poor.

Tenth, the New Global Medicine is a microcosm of how a few thousand revolutionaries can change the world. They do not need vast riches, expensive technology, or a massive increase in personal possessions to improve the quality of people's lives. If dedicated to helping people while learning from those they help, they can prefigure a new world by carefully utilizing the resources in front of them. Such revolutionary activity helps show a world facing acute climate change that it can resolve many basic human needs without pouring more CO2 into the atmosphere.

Discussions of global health in the West typically bemoan the indisputable fact that poor countries still suffer from chronic and infectious diseases that rich countries have controlled for decades. International health organizations wring their hands over the high infant mortality rates and lack of resources to cope with natural disasters in much of the world.[12]

But they ignore the one health system that actually functions in a poor country, providing health care to all of its citizens as well as millions of others around the world. The conspiracy of silence surrounding the resounding success of Cuba's health system proves the unconcern by those who piously claim to be the most concerned.

How should progressives respond to this feigned ignorance of a meaningful solution to global health problems? A rartional response must begin with spreading the world of Cuba's New Global Medicine through every source of alternative media available. The message needs to be : Good health care is not more expensive – revolutionary medicine is far more cost-effective than corporate-controlled medicine.

[Courtesy : Debasis Bhattacharjee]

- ভারতকে বলা হয় তৃতীয় বিশ্বের ফার্মেসী। এখানে প্রচুর পরিমাণে ও তুলনামূলক কম দামে জীবনদায়ী ওষুধ তৈরী হয় এবং দেশের বিশাল সংখ্যক AIDS / HIV + ve সহ রোগীদের চিকিৎসা সহ অন্য দেশে রপ্তানী করা হয়। ওষুধ কোম্পানীগুলির প্রভাবে EU যেমন নতুন কপিরাইটে বেঁধে ফেলে এখানকার লাভজনক ওষুধ শিল্প ও বিপুল বাজারকে ধরতে চাইছে, একইভাবে আমেরিকার ওবামা প্রশাসন চাপ দিয়ে এখানকার ওষুধের দাম বাড়িয়ে মার্কিন কোম্পানীগুলির বেশী মুনাফার ব্যবস্থা করতে চাইছে।
- ছত্তিশগড়ের কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সমৃদ্ধ রায়গড় জেলায় জিন্দাল স্টীল ও পাওয়ার লিমিটেডের বেআইনী কার্যকলাপের বিরোধিতা করায় 'জনচেতনা মঞ্চে'র উদ্যোক্তা ও পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক রমেশ অগ্রবালকে ভাড়াটে গুণ্ডারা গুলি করে।
- ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী নিকোবরের নারকোন্ডাম দ্বীপে রাডার বসানোর পরিকল্পনা করায় অবলুপ্তপ্রায় নারকোন্ডাম ধনেশ (Narcondam hornbill) অবলুপ্ত হয়ে যাবে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ধারণা।
- মধ্যপ্রদেশে নর্মদার উপর ওঙ্কারেশ্বর বাঁধ তৈরীর ফলে শয়ে শয়ে উচ্ছেদ হওয়া কৃষিজীবী পরিবার 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের (NBA)-র নেতৃত্বে জলসত্যাগ্রহ সহ খান্ডোয়া জোল সদরে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন।
- WHO সম্প্রতি নিম্নমানের ভেজাল, মিথ্যা লেভেল লাগানো, ভুল ও নকল ওষুধের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন।
- তুরস্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গর্ভপাত ও সিজারিয়ান সেকশন নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের কথা ঘোষণা করায় কয়েক হাজার মহিলা ইস্তামবুলের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।
- অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে বিকিরণ ও উষ্ণতার কারণে কান, চোখ ও মস্তিষ্কের সমস্যা সহ নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে মোবাইল টাওয়ারের অতিরিক্ত বিকিরণের ফলে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত আন্তঃমন্ত্রক গোষ্ঠী তাই মোবাইল ব্যবহার ও টাওয়ার বসানো এবং তাদের বিকিরণ গ্রহণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করছেন।
- UNICEF-র একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সারা বিশ্বে বছরে যে ২০ লক্ষ শিশু সহজে নিরাময় করা যায় যেমন নিউমোনিয়া ও ডায়েরিয়া রোগে মারা যায় তার বেশিরভাগই পাঁচটি দেশের ঃ ভারত, নাইজিরিয়া, কঙ্গো, পাকিস্তান ও ইথিওপিয়া। দারিদ্র, বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা যুদ্ধবিগ্রহ,অসচেতনতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এর প্রধান কারণ। অথচ মলত্য াগের পর খাবার ও খাওয়ার পরিবেশনের আগে এবং শিশুদের পরিচর্যার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুলেই রোগের হার অনেক কমে যায়।
- ১৯৮৩ সালে গৃহীত ও ১৯৮৮ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হাতে উদ্বোধন হওয়া নাগপুরের অদূরে ওয়েনগঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত ভান্ডারার গোশিখুরড মেগা রিভার প্রজেক্ট এখনও সম্পূর্ণ হল না। ৩৭২ কোটি টাকার প্রকল্প এখনবধি দাঁড়িয়েছে, ৫,০৯৯ কোটি টাকায়। বিশেষজ্ঞদের মতে দাঁড়াবে ১৪,০০০ কোটি টাকায়। শুখা বিদর্ভতো জল পেলইনা, বরং বহু কৃষককে জমি ঘরবাড়ি ছেড়ে উচ্ছেদ হতে হল।

which are being run parallel to eath other for decades together now.

This dependence is why, a BPHC doesn't have a Hb testing facility !!

To my mind, this is the area where all our attacks be targeted at. I'm of course not saying that we need to keep mum about the misuse and plunder that is still taking place on donated/aided foreign money. But this crucial dependence on foreign money needs to be seriously questioned and attacked.

Bye the way, can anyone tell me whether this money coming as aid, donation and soft loan included in the total budget? Is it included in the budgetary provision [0.9%, promised to be scaled up to 3%]? This has tobe figured out, as this would has some profound implication on our slogans and strategies.

Whither Primary Health Care?

B. Roy

Failure of Medicine : Only 10 to 20% of the population of developing countries have been enjoying ready access to health services of any kind. With the increased medical cost, increased benefits in terms of health has not been materialized. Despite spectacular advances in medicine, the threat posed by certain emerging and re-emerging fatal diseases has not lessened, rather has actually increased. The expectation of life has remained low and infant and child mortality rates have been high in many developing countries. Historical epidemiological studies showed that significant improvements in longevity had been achieved through improved food supplies and sanitation long before the advent of modern drugs and high technology. There is no equity in the distribution of health services, resulting in limited access to health care for large segments of population. Modern medicine shows elitist oroentation even in health systems adapted to overcome social disparities.

Health for All : On going struggles of the people has made popular new ideas and concepts (e.g. increasing importance attached to social justice and equity, recognition of the crucial role or community participation, changing ideas about nature of health and development, the importance of political will) which challed for new approaches to make medicine in the service of humanity more effective.

The 30th world Health Assembly resolved in May 1977, that the "main social target of governments and WHO in the coming decades should be the attainent by all citizens of the world by the year 2000 a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive live." This culminated in the international objective of **Health for All by the year 2000** as the social goal of all governments. Viewed in the long-term context, it simply means the realization of the WHO's objective of "attainment by all people of the highest possible level of health."

In a Joint WHO-UNICEF international conference in 1978 at Alma Ata (USSR), the government of 134 countries and many voluntary agencies called for a revolutionary approach to health care and declared that "The existing gross inequality in the health status of people particularly between developed and developing countries as well as within countries is politically, socially and economically unacceptable."

Primary Health Care is a new approach to health care system, which integrates at the community level all the factors required for improving the health status of the population. It consists of at least eight elements described as **"Essential Health Care"**. (1) Education about prevailing health problems and methods of preventing and controlling them; (2) Promotion of food supply and proper nutrition; (3) An adequate supply of safe water and basic sanitation; (4) Maternal and child health care, including family planning; (5) Immunization against infections diseases; (6) Prevention and control of endemic diseases; (7) Approprite treatment of common diseases and injuries and (8) Provision of essential drugs.

The Alma Ata Declaration had called on all governments to formulate national policies, strategies and plans of action to launch and sustain primary health care as part of national health system.

Against this background, under **'Global Strategy for Health for All"** by the 34th World Health Assembly, in 1981, the members of WHO including India pledged themselves to an ambitious target to provide **"Health for all by the year 2000"**, that is attainment of a level of health that will provide all people "to lead a socially and economically productive life."

But the government failed to materialize this call and settled on a compromising measure.

The Millennium Development Goals : In September 2000, representatives from 189 countries met at the Millennium Summit in New York (USA) to adopt the United Nations Millennium Declaration. The leaders made specific commitments in seven areas : (1) Peace, security and disarmament; (2) Development and poverty eradication; (3) Protecting our common environment; (4) Human rights, democracy and good governance; (5) Protecting the vulnerable; (6) Meeting the special needs of Afica and (7) Strengthening the United Nations. The Road Map established goals and targets to be reached by the 2015 in each seven areas. The MDG place health at the heart of development and represent commitments by governments throughout the world to do more to reduce poverty and hunger, to tackle ill-health, gender inequality, lack of education, to give access to clean water and to prevent environmental degradation.

Three decades of Primary Health Care : Despite enormous progress in health globally, our collective failure to deliver in line with these values are painfully obvious and deserve our greatest attention on significant regional, inter-and intra-country variations, social and health inequalities.

One third of the world population still do not have access to essential maternal and child health services, safe water supply and food security. A girl born today in developed world is expected to live 80 years and if born in some developing countries, will live less than 45 years. More than 50% deliveries in India are outside institutions, and 30% deliveries are not conducted by any skilled person. Only 44% infants in India receive full primary immunizations. For 5.6 billion people in this world over half of all health care expenditures are through out-of-pocket payments, which are pushing more that 100 million people into poverty annually.

The current trends are that of (a) The Government's role becoming more and more marginalized, (b) Increasing dependence on external funding (c) Accelerated role of donor agencies that are taking centre-stage in influencing policies, (d) Corporatization of health system, (e) Rising role of private medical insurance companies and (f) Unregulated commercialization of health care delivery system. Reflections of these negative trends are obvious in most countries including India, resulting in disproportionately high focus on city and hospital based specialist services, fragmented approach to service delivery throough selective increasing privation and commercialization of health system. Medical equipment and pharmaceutical industries are a dominant driving force behind the trend. They are promoting and facilitating the specialist or super-specialist centred services by aggresive marketing and business promotion stategies and by influencing the economic, industrial and health policies of the countries. Economic liberalization (globalization) has opened up avenues for massive private investments in health.

The health systems, throughout the world, evidently, have deviated too much from the principles of primary health care. Economic and health disparites have actually aggravated in last three decades. Only a strong political commitment may reverse the situation and make primary health care the foundation of the health system around which the secondary and tretiary services should evolve. In India, **National Rural Health Mission (2005-12)** has intended to address some of the issues of equity and accessibility in the vulnerable section. But this too suffers from the problem of fragmented approach, supra structural excercises, polices not suited to field situation, reluctance from the parts of service providers, unsteady supply of fund and logistics, bureaucracy, high-handedness, time lag, corruption, nepotism etc. and mostly do not address the social determinants and felt needs.

Commemorating 30 years of Alma Ata : Participants from 65 countries throughout the globe came together in Almaty, Kazakhstan, on 15 & 16th October, 2008 and exchanged the lessons and experiences of the last three decades after Alma Ata and discussed their relevance and application to the health challenges to today's world.

They reiterated that countries have to fully adopt Primary Health Care (PHC) as the foundation of their health systems. They strongly endorsed the values and principles contained in the Declaration of Alma Ata on PHC. They declared timeliness, equity, solidarity, the right to the highest attainable level of health and universal access to services are the key to health for all. The challenge is to apply them to the policies and processes required to strengthening national health systems.

The conference took place at the time of grave crisis in the international financial system. A number of countries were taking action to revise their budgets for the coming years. Participants called upon governments and international financial institutions not to repeat past

mistakes when restructuring had resulted in often-large reductions in allocations to the health and other fundamental social sectors. Ensuring strong health and social protection, especially for vulnerable populations, is a lesson of history. The conference unanimously called upon governments to protect health budgets and to seize opportunity of crisis to accelerate change towards strengthening their health systems based on the values and principles of PHC.

Integrated models of PHC which include preventive, promotive and primary care are the best models to deliver holistic and people-centred services and should be adapted to the specific needs and resources of individual countries. In this regard, the increasing need to focus on chronic diseases is now a global challenge, not just a problem of rich countries. This comes on top of an unfinished agenda related to communicable diseases, and maternal, new born and child health.

Crisis of global financial system and health : It is not clear what the current financial crisis will mean for low-income and emerging economies, but many predictions are highly pessimistic. In the face of a global recession, fiscal pressures in affluent countries may prompt cuts to official development assistance. Worse still, is the prospect of cuts in social spending-health, education and other social sectors-that many countries, especially low-income countries, may be forced to undertake. Both of these responses have occurred in the past. Both could be as equally devastating for health, development, security and prosperity as they were in the past.

It is essential therefore to learn from past mistakes and counter this period of economic downturn by increasing investment in health and social sector. There are several strong reasons supporting this line of action; (1) To protect the poor (2) To promote economic recovery; (3) To promote social stability; (4) To generate efficiency and (5) To build security.

Dr. Margaret Chan, Director General, WHO, appeals "I'm calling on all governments and political leaders to maintain their efforts to strengthen and improve the performance of their health systems, to protect the health of the people of the world, and in particular of those most fragile, in face of the present financial and economic crisis."

Our pledges : In the past, the international organizations, national and state governments miserably failed to keep up to all their commitments on health particularly in developing countries. This time there are seen concerted conspiracies by them to undermine health and education in the name of financial crisis of global capitalism or in the name of terror. Therefore the situation demands to be united by all progressive and democratic forces throughout the globe to foil these conspiracies and to establish people's health by people's movement emphasizing on equitable primary health care to all.

[Invited in 16th Canadian Conference on International Health 2009 in Ottawa.]

Citizens' Initiative on Workers' Health

K. Dutta

Why Citizens' Initiative?

Why independent citizens' initiative to ensure workers' health? Because, the dismal state of health care has become serious enough to be a general social concern. The rapid economic growth of the previous decade has not helped to improve the situation; rather it has increased the gulf of disparity among social classes in access to health care. According to a survey conducted by the Indian institute of Population Sciences and WHO in six states more than 40 per cent of low-income families in India have to borrow money from outside the family to meet their health care costs and 16 per cent families had been pushed below the poverty line by this trend.

A crisis of this social magnitude calls for the intervention of concerned citizens. It needs an initiative which will be sensitive to the need of health security of toiling mass but will not hesitate to recognize enormous difficulties in realizing that dream. During its first discussion held on 26th, November 2011, (at Seva Kendra, Kolkata) the Citizens' Initiative has deliberation on following issues.

Ensuring health security of entire working population.

West Bengal has approximately 3 crore working population. Given the rising cost of health (-are, this entire population needs the protection of a comprehensive social security network like ESI. But ESI in this state provides social security to only 10 lakh families.

What about others? Why the majority sections of workers are left outside the safety network of ESI? This issue needs a closer scrutiny.